SEM-4, CC-4, M

'কপালকুণ্ডলা'

(১) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের নামকরণ:-

নামকরণ যে কোনো সাহিত্যের ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নামের মধ্য দিয়েই প্রথম সাহিত্যের অবলম্বিত বিষয় পাঠকের কাছে পৌঁছায়। তাই বিষয়গত-চরিত্রগত তাৎপর্যগত, যাই হোক না কেন, নামকরণকে সার্থক করতেই হয়। দু একটি ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র বাদ দিলে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নামকরণের ক্ষেত্রে চরিত্রভিত্তিক নামকরণই পছন্দ করতেন, 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'সীতারাম', যেমন পুরুষ চরিত্র কেন্দ্রিক নামকরণ, তেমনি 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী', এগুলি নারীচরিত্র কেন্দ্রিক নামকরণ। এই সব ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে নামকরণে অবলম্বিত নারীরা শুধুই কাহিনীর নায়ক নয়, বরং তারাই এখানে প্রধান চরিত্র, তাদের ঘিরেই কাহিনী আবর্তিত। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও এমনই ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পঞ্চভূত' গ্রন্থের 'নরনারী' প্রবন্ধে যে মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলার পাশে নায়ক নবকুমারকে নিতান্তই নিষ্প্রভ চরিত্র বলেছিলেন।

কপালকুণ্ডলার গৃহী-জীবনে বঙ্কিমচন্দ্র তার 'মৃন্ময়ী' নামকরণ করেছিলেন। কিন্তু তাকে বাইরে কপালকুণ্ডলা সম্পূর্ণভাবে কোনোদিনই মৃন্ময়ী হয়ে উঠতে পারেনি। তাই এক বৎসরের গৃহজীবনের পরও সে চেয়েছে সমুদ্রতীরের অরণ্যে ঘুরে বেড়াবার সুখ। এমনকি পরহিতব্রত ভেবে নবকুমারের সাথে তার সাক্ষাৎ, সেই পরোপকারকেও সে কোনোদিন ভুলতে পারেনি। তাই অসহায় শ্যামাসুন্দরীর স্বামীসুখ এনে দেবার জন্য সে যেমন স্বামীর বিরক্তি সত্ত্বেও নির্মল অরণ্যে এক্কা ওষধি আনতে চেয়েছে, আবার ব্রাহ্মণ কেশী নিজের সপত্নী পদ্মাবতীকে নিজের স্বামীও দান করতে চেয়েছে। সুতরাং কপালকুণ্ডলা প্রথম থেকে

শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক প্রবৃত্তি-বাসনা করতে পারেনি। এমনকি যে ভক্তি-বিশ্বাস তার চরিত্রের অঙ্গ তার ক্ষেত্রেও সে সত্য থাকেনি। বরং স্বপ্নের মধ্যে নিমগ্ন নৌকাকে সে ভেলাকে দেখতে পেয়েছে তাতে তার অদৃষ্ট নির্ভরতা প্রকাশ। আবার কপালকুণ্ডলাকে আমরা প্রথম দেখা যেখানে মুক্ত প্রকৃতির মাঝখানে বনদেবীর মতো দেখেছি, অন্তিমেও সে সেভাবেই বনপ্রদেশে যাত্রা করেছে। বিবাহকে সে দাসীত্বের শৃঙ্খল রূপে মেনে নিতে পারেনি। সুতরাং কপালকুণ্ডলা এখানে আমাদের এই চরিত্র ধর্মে অবিচল, সে এই রকম মুক্তবিহঙ্গ, বলচারিণী, পরোপকারিণী, উদার হৃদয়। এই কপালকুণ্ডলাই কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র। তাই তার নামেই কাহিনীর নামকরণ সার্থক।

নবকুমারকে নির্জন সমুদ্র তীরবর্তী অরণ্যে কাপালিকের নিষ্ঠুরতা থেকে উদ্ধার করে কপালকুণ্ডলা। অধিকারীর মধ্যস্থতায় নবকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কিন্তু তার এই বিবাহিত জীবনে স্থায়ী শত্রু হয়ে দাঁড়ায় তার সেই পূর্ব পালনকর্তা কাপালিক। আপাতত তার হস্ত পদ ছেদ হলেও সে কপালকুণ্ডলার পিছু ছাড়েনি। বরং তার স্বামী সুখের নিকটবর্তী অরণ্যে উপস্থিত হয়ে সে কপালকুণ্ডলার শত্রুতা সাধন করেছে। পৌরুষের বা স্বামীত্বের যা চিরকালীন ছিল, সেই স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ ও অবিশ্বাস বাসিয়েছে সে নবকুমারকে কপালকুণ্ডলার সামনাকে শত্রু বানিয়ে তুলেছে। যদিও পরে রূপোন্মত্ত লোলোবসার কাছাকাছি নবকুমার-কপালকুণ্ডলার পার্শ্বচর-ব্রাহ্মণকুমারকে তারই স্ত্রী-পদ্মাবতী বেনে সন্দেহমুক্ত হয়েছে। অন্য দিকে নবকুমার যে বিমাতৃরিতা লুৎফুন্নিসাকে ভোগবতী, বিলাসিনী রূপে মেনে, তাকে তার পদ্মাবতী রূপে মেনে নেবে না, তাও বুঝতে পারে লুৎফুন্নিসা। ভুল করে সে ভাবে, বুঝি কপালকুণ্ডলাই তার স্বামীর উদাসীন্যের কারণ। এই ক্ষেত্রে সে কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের জীবন থেকে সরাবার জন্য মেহের

এই অরণ্য আশ্রমে, যেখানে কপালিক এই উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে। অবশ্য লুৎফুন্নিসা কপালিকের মত কপালকুণ্ডলীর পরিবর্তন বা মৃত্যু কামনা করেনি। কিন্তু মানুষের জীবনের দুর্ভাগ্যবশত সবটি তখন নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার জীবনকে ঘিরে ফেলেছে। তারা তাই কালস্রোতে ভেসে গেল। আর পদ্মাবতীর জন্য রইল নিঃসীম শূন্যতা। এই সমস্ত ঘটনাই এখানে কপালকুণ্ডলাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে তাই কাহিনীর কপালকুণ্ডলা নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে।

—x—

(২) 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে প্রকৃতির ভূমিকা:-

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস বড় ইতিহাস অথবা সমাজের প্রেক্ষাপট ছাড়াও রচিত হতে পারত, কিন্তু প্রকৃতির চালচিত্র ছাড়া উপন্যাস অসম্ভব ছিল। সমুদ্র-অরণ্য-গ্রাম-বুনো মঙ্গল-সন্ধ্যা-রাত্রির অপরূপ মায়াময় সৌন্দর্যই এ উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে।

উপন্যাসের নায়ক নবকুমার সমুদ্র দর্শন করে রূপাভিভূত চিত্তে উচ্চারণ করেছে কালিদাসের 'রঘুবংশ'-র সমুদ্র বর্ণনার শ্লোক, উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সে বলেছে- "আহা! কি দেখিলাম! ইন্দ্রজালেও ভুলিব না।" হুগলীমুখে সমুদ্রে পথহারা সেই নৌকার যাত্রীদের সাহায্যার্থে নবকুমার কাছি আহরণ করতে নিয়ে সমুদ্র উপকূলে তিন অরণ্যে এসে কাছি নির্ধারিত হল। সেই অন্ধকারে শিশির ভেজা আকাশে তারা ফুটলো। "অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন, আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব।" সেই নীরবতার মাঝে কোলাহলে উচ্ছ্বসিত সমুদ্র গর্জন, এই গভীর রাত্রিতে নবকুমার একাকী। পরদিন দিবসের শেষে নীলাম্বুরাশি তীরে সন্ধ্যার অপরূপ শোভা আবারও দর্শন করেছে কুমার।

তার সামনে যেন দেবময় অনন্ত সমুদ্র, মাথার উপর সুবিশাল নক্ষত্রখচিত কালো আকাশ। এই দিগন্ত বিস্তৃত নীরবতার মাঝে পথহারা নবকুমার প্রকৃতি-কন্যা কপালকুণ্ডলার কণ্ঠস্বরে ছুটে পেল পথের দিশা। আকাশ পিদের মাঝখানেও যেন কপালকুণ্ডলার কণ্ঠস্বরমাত্রেই এক সৌন্দর্যের সাগর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, লেখক আলোচিত হৃদয়ে লিখলেন- "সাগরবেলা পৃথিবী সুন্দরী, রমণী-সুন্দরী, ধ্বনিও সুন্দর, হৃদয়ও সুন্দর, সর্ব্বে সৌন্দর্যের লয় মিলিত পরমিল।"

সৌন্দর্যই এখানে ঈশ্বর; সৌন্দর্যই এখানে পরম রম্য। তাই নিবু নিবু আলোর চকচকে হাবিপাড়ের মুহূর্তে নবকুমার দিগন্ত বিস্তৃত আকাশ-সাগর-রমণীর মাঝখানে অবস্থিত এই রমণীমূর্তিকে চির সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে করেছে।

কপালকুণ্ডলার উপন্যাসের কেন্দ্রীয় কাল অংশ— জুড়েই আছে সন্ধ্যার বা রাত্রির অন্ধকার— আবরণ। এই অন্ধকার কোথাও দিশাহীন, কোথাও রহস্যময়, কোথাও গভীরতর। রমণীরূপ সৌন্দর্য আর প্রকৃতি রূপ-সৌন্দর্য এখানে একাকার হয়ে গেছে, তার অতিরিক্ত সৌন্দর্যে মিশে আছে পূর্ণ চন্দ্রালোকের আলো। তার রূপে-যৌবনের ভরা নদীর উচ্ছলতা, আর কপালকুণ্ডলার খোলা চুলের রহস্যে যেন প্রকৃতিরই অনন্ত রহস্যময়তা পরিব্যাপ্ত।

আবার নবকুমারের সপ্তগ্রামের বাড়ির পিছনেই আছে বিস্তৃত সুপারীর অরণ্যানী। পাখির গানে মুখরিত সেই বনানীতে প্রকৃতির রহস্যময়তা পরিব্যাপ্ত। দূরে লোকালয় মমন্বিত কেকারবীতে সন্ধ্যার আঁধারের গভীরতা, এমনই পরিবেশে কপালকুণ্ডলা বলিয়াছে যে, একদিন সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াতে সেই তার মুখ হবে।

এরপর শ্যামাসুন্দরীর দ্বারা ঔষধ সংগ্রহ করতে গিয়ে সেই নিশ্চিত অরণ্যে কপালকুণ্ডলা কাপালিক ও পদ্মাবতীর চক্রান্তের শিকার হয়ে নবকুমারের অভিশাপের বলি হল ও মৃত্যুর সম্মুখীন হল।

কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদৃশ্যে হঠাৎই যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের দৃশ্য হয়, লেখক এই বর্ণনায় লিখছেন— "অকস্মাৎ রাত্রি হইল, সূর্য কোথায় গেল। সঘন মেঘমালা কোথায় গেল, নিশ্চিত নীল আকাশ আসিয়া আকাশ ব্যাপিয়া ফেলিল।" এই প্রাকৃতিক মেঘান্ধকার যেন এখানে কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যতের দিক নির্দেশ করে।

তারপর কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারের অন্তিম পরিণতিকে গল্পাংশের বলপ্রবাহে ভাসিয়ে দিয়ে এই উপন্যাস প্রকৃতির ছবিতেই যেন আরো উজ্জ্বল করে তুলেছেন ঔপন্যাসিক, এইভাবে প্রকৃতির পটভূমিই অনালোচ্য উপন্যাসটিকে অনন্য করে তুলেছে।

—x—

৩) কপালকুণ্ডলা ও লুৎফুন্নিসার তুলনামূলক আলোচনা:-

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের পরিকল্পনায় চরিত্রচিত্রণের ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য বৈপরীত্য এনেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেও এইরূপ নায়ক নবকুমারকে কেন্দ্র করে দুটি বিপরীত বৈশিষ্ট্যে মেশানো নারীচরিত্রের অবতারণা ঘটেছে। এদের একজন প্রকৃতি লালিতা সরলা কপালকুণ্ডলা, অন্যজন চতুরবুদ্ধিশালিনী নাগরিক রমণী লুৎফুন্নিসা বা মতি বিবি, যে প্রথমদিকে ছিল নবকুমারের প্রথম পত্নী পদ্মাবতী।

সমালোচকও তাই এদের বৈপরীত্যের আলোচনা করে বলেন - "উপন্যাসের প্রধান দুই নারীচরিত্র: কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি পরস্পরের বিপরীতধর্মী চরিত্র। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি পালিতা, অনাবিল-চিত্ত, স্নেহপরায়ণা, পরদুঃখকাতরা, লোকভয়-রহিতা ও ভক্তিমতী, মতিবিবি স্ফুটিত যৌবনোত্তপ্ত আত্মহারা, নিয়তিপ্রাপ্তা, কূটবিষয়বুদ্ধিসম্পন্না, আত্মসুখান্বেষিণী, ইন্দ্রিয়সম্ভোগরতা ও ধর্ম-জ্ঞানবিস্মৃতা।" (উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম, প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত)।

এই দুই রমণীই স্বাধীনচেতা। কিন্তু কপাল-কুণ্ডলার কাছে স্বাধীনতার অর্থ সমাজ বন্ধন বিহীন প্রাকৃতিক সংস্পর্শ, আর মতিবিবির স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর। এই মতিবিবি একদিন ছিল সপ্তগ্রামের সুন্দরী পদ্মাবতী, তখনো সে ছিল তেজস্বিনী, নবকুমারের সাথে চিরকাল বেঁধে দিল তেজস্বিনী পদ্মাবতীর স্মৃতি। এর পর পদ্মাবতী হল লুৎফুন্নিসা, আগ্রার রাজমহলে সে 'প্রতি পুষ্প বিহারিণী মধুকরী'র মতো কাটাতে লাগলো, এর পর একদিন দূর স্বামী নবকুমারকে দেখে তার সকল পূর্ব স্মৃতি বেসে উঠলো, সে ঘরবাড়ি সোনাদানা, আগ্রার আমীর ওমরাহ, বিলাসব্যসন সব কিছু ছেড়ে পূর্ব স্বামীর কাছে ফিরতে চাইলো। তার শূন্য কারণে কাতরপ্রেম,

কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবি দুজনেই রূপসী নারী, তবে লেখক দুই নারীর রূপের তুলনা করেছেন। রূপসী হয়েও মতিবিবি তবু কপালকুণ্ডলার এরূপ সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে। মতিবিবি অলঙ্কারে সজ্জিতা, কপালকুণ্ডলা নিরাভরণা। মতিবিবি উদ্যানের মধ্যে রোপিত বৃক্ষ, আর কপালকুণ্ডলা মুক্ত প্রকৃতির কন্যা। মতি যখন আপন অলঙ্কারের কপালকুণ্ডলাকে মানালো, তা রূপের উদ্দেশ্যে তার শ্রদ্ধাঞ্জলি,

কপালকুণ্ডলা সরলা, নামতিক লীলাবিলাস, অলঙ্কার প্রিয়তা তাঁর নেই। তাই মতি লেখাকে বলে, "সহনা সুন্দরী না হয়, দেখাইবার জন্য পারিতাম। স্ত্রীলোকের সহনা যাইবে, যে না দেখাইলে বাঁচে না।" কিন্তু কপালকুণ্ডলার সহনার প্রতি কিছুমাত্র আসক্তি নেই, তাই কিছুক্ষণ চাওয়া মাত্র সে সহনা খুলে তাকে দেয়। মতিবিবি আত্মকেন্দ্রিক, আত্মসুখের জন্যই সে দুর্গস্বামীকে কামনা করেছে। কপালকুণ্ডলা পরের উপকারের জন্য আত্মনিবেদিত। নবকুমার দেখে শ্যামাসুন্দরী, সে সকলেরই উপকার করতে চেয়েছে। নবকুমারের ক্ষেত্রেই শেষপর্যন্ত এই দুই নারীর জীবনবৃত্ত প্রেমমার্গিত হয়েছে। এই দুই নারীর সাদৃশ্য উল্লেখ করে প্রেমকাব্যবিদ তাঁর 'বঙ্কিম-সরণী' গ্রন্থে লেখেন- "দুজনেই অপরূপ-সুন্দরী, দুজনেই অসামান্যা, একজন অরণ্যবাসিনী, অপরজন নগরবাসিনী, দুজনেই বিদুষী এবং অপহৃতা।" কিন্তু বৈপরীত্যও এদের মধ্যে কম নয়, মতিবিবি জোর করে আত্মমন্দিরে নবকুমারকে ধরে রাখতে চেয়েছে। আর কপালকুণ্ডলা নিষ্কামধর্মে তাঁর অন্তঃকরণে যেখানে তাঁর স্বামীকে ছুঁতে দেয় না, তাই মৃত্যু তাঁর কাছে অতি সহজ হয়ে এসেছিল। কপালকুণ্ডলা ও মতিবিবিকে বৈপরীত্যের মধ্য দিয়েই উজ্জ্বল করে তুলেছেন লেখক। পদ্মাবতী ও লুৎফুন্নিসা, মতিবিবির মধ্যে ছিল এই দুই সত্তার দ্বন্দ্ব চলেছে। কপালকুণ্ডলার মধ্যেও অরণ্যজীবন ও নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব চলেছে। শেষপর্যন্ত মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কপালকুণ্ডলার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। লুৎফুন্নিসার এমনটিও, চাওয়াই কোনো তাকে জীবনের মধ্যেই মৃত্যুর যন্ত্রণা এনে দেয়।

—x—